# দিনবদলের সনদ ও সরকারের সাড়ে তিন বছর

**সুজন**-সুশাসনের জন্য নাগরিক (১১ জুলাই, ২০১২)

২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনে বিপুল বিজয়ের মধ্যদিয়ে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মহাজোট সরকার গঠিত হয়। এই বিপুল বিজয়ের নেপথ্যে মূল ভূমিকা পালন করেছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের 'দিনবদলের সনদ' শিরোণামে ঘোষিত নির্বাচনী ইশতেহারের অঙ্গীকারসমূহ। ইতোমধ্যে মহাজোট সরকারের সাড়ে তিন বছর অতিবাহিত হয়েছে। তাই মহাজোটের নেতৃত্বদানকারী আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারের প্রতিশ্রুতিসমূহ কতটুকু বাস্তবায়িত হয়েছে, তা মিলিয়ে দেখাই আজকের এ গোলটেবিল আলোচনার উদ্দেশ্য।

দিনবদলের সনদে মোট ২৩টি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি চিহ্নিত করা হয়, যার মধ্যে পাঁচটিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের খাতগুলো হলো: **দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধ ও বিশ্বমন্দার প্রভাব মোকাবিলা; দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা; বিদ্যুৎ ও জ্বালানী সমস্যা নিরসনে উদ্যোগ গ্রহণ; দারিদ্র্য ও বৈষম্য নিরসন; সুশাসন প্রতিষ্ঠা**। অর্থাৎ এগুলো অর্জনের ক্ষেত্রে সরকারের সর্বাধিক এবং সর্বাগ্রে মনোযোগী হওয়ার কথা। এ পাঁচটিসহ স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত অগ্রাধিকারকে ভেঙ্গে সরকারের সুস্পষ্ট অঙ্গীকারগুলো এবং তার বিপরীতে অর্জনগুলো আমরা নিম্নে তুলে ধরছি। এর সাঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গীকারসমূহ এবং সেগুলো বাস্তবায়নে অগ্রগতি।

| অঙ্গীকার | বাস্তবায়নের অগ্রগতি/ব্যর্থতা |
|---|---|
| **১. দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধ ও বিশ্বমন্দার মোকাবেলা** | |
| দ্রব্যমূল্যের দুঃসহ চাপ প্রশমনের লক্ষ্যে চাল, ডাল, তেলসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দাম জনগণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে স্থিতিশীল রাখার ব্যবস্থা করা। | নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দাম না কমে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিবিএস-এর তথ্যানুযায়ী, ১৯৯৫-৯৬ সালকে ভিত্তি (অর্থাৎ ১০০) ধরে খাদ্যদ্রব্যের মূল্যসূচক ২০০৮-০৯ অর্থবছরে ছিল ২২১.৬৪, ২০০৯-১০ অর্থবছরে ২৪০.৫৫, ২০১০-১১ অর্থবছরে ২৬৭.৮৩, যা ২০১২ সালের মার্চ মাসে এসে দাঁড়িয়েছে ২৯৭.৭৭-এ। ফলে গত সাড়ে তিন বছরে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য প্রায় ৩৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ বর্তমান সরকারের আমলে দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখা যায়নি। তবে এসব তথ্য থেকে সাধারণ মানুষের ব্যবহৃত পণ্যমূল্য বৃদ্ধির প্রকটতা এবং তাদের দুর্ভোগ পুরোপুরি অনুভব করা যায় না।<br>ক্যাবের তথ্যানুযায়ী, বিআর-১১ ও বিআর-৮ এর গড় মূল্য ২০০৯ এর ২৩.২২ টাকা থেকে মে ২০১২তে ৩০ টাকায় (২৯ শতাংশ বৃদ্ধি) এসে দাঁড়িয়েছে। একইসময়ে খোলা আটার দাম বেড়েছে ২০.৮৫ টাকা থেকে ৩৪ টাকায় (৬৩ শতাংশ বৃদ্ধি), সয়াবিন তেলের ৮২.৮৯ টাকা থেকে ১৩৮ টাকায় (৬৬ শতাংশ বৃদ্ধি), আর দেশি মসুরির দাম কমে ১১১.৭৫ টাকা থেকে ১০৫ টাকা (৬ শতাংশ কমেছে) হয়েছে। বাড়ি ভাড়ার ক্রমবর্ধমান উর্ধ্বগতি ও জ্বালানীর সাম্প্রতিক মূল্য বৃদ্ধি শহরের সাধারণ জনগণের জীবনমানে ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। |
| মজুদদারী ও মুনাফাখোরি সিন্ডিকেট ভেঙ্গে দেওয়া এবং চাঁদাবাজি বন্ধ করা। | ব্যবসায়ে কারসাজি নিয়ন্ত্রণের জন্য গত ১৭ জুন, ২০১২ তারিখে জাতীয় সংসদে 'প্রতিযোগিতা বিল-২০১২' পাস হয়েছে। সিন্ডিকেট বাণিজ্য রোধে নতুন এ আইন কার্যকর করা হলে বাজার নিয়ন্ত্রণকারী মধ্যস্বত্বভোগীদের হাত থেকে ক্রেতারা রক্ষা পাবে বলে সরকার মনে করছে। তবে গত ১৮ ফেব্রুয়ারি এফবিবিসিসিআই মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে বর্তমান বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব জিএম কাদের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণ হিসেবে মধ্যস্বত্বভোগীরা নয়, অব্যাহতভাবে চাঁদাবাজিকে দায়ী করেছেন। তিনি অভিযোগ করেছেন যে, পরিবহনে চাঁদাবাজিকে বৈধতা দেয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। কারণ সরকারেরের নির্বাচনে জয়লাভের জন্য লাঠিয়াল বাহিনী দরকার। তাই বাধ্য হয়েই এসব চাঁদাবাজিকে প্রশয় দিতে হবে (www.businesstimes24.com/?p=18684)।<br>চাঁদাবাজির খবর প্রতিনিয়ত গণমাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছে। এ ব্যাপারে সরকারের সুনির্দিষ্ট কোনো পদক্ষেপ লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। |
| ঁজনশক্তি রপ্তানি অব্যাহত রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ | প্রবাসি কল্যাণমন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মোশাররফ হোসেনের মতে, বর্তমান সরকারের আমলে গত তিন বছরে প্রায় সাড়ে ১৭ লাখ কর্মী বিদেশে চাকুরি পেয়েছে (জনকণ্ঠ, ১ জুলাই ২০১২)। কিন্তু সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের তথ্যানুযায়ী, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের কর্মী পাঠানো হার অর্ধেকে নেমে এসেছে (ইত্তেফাক ১৯ জুন, ২০১২)। ২০০৭ সালে সাড়ে আট লাখ ৩২ হাজার ৬০৯ জন এবং ২০০৮ সালে আট লাখ ৭৫ হাজার ৫৫ জন কর্মী বিদেশে গিয়েছিল। ২০০৯ সালে বিদেশ যায় চার লাখ ৭৫ হাজার ২৭৮ জন। ২০১০ সালে এ সংখ্যা আরেক দফা কমে দাঁড়ায় তিন লাখ ৯০ হাজার ৭০২ জনে। তবে ২০১১ সালে যা বেড়ে হয় পাঁচ লাখ। ২০১২ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত দুই লাখ ৪৪ হাজার ১০৯ কর্মী বিভিন্ন দেশে গিয়েছে (জনকণ্ঠ, ১ জুলাই ২০১২)।<br>গত সাড়ে তিন বছরে নতুন শ্রমবাজার সন্ধানে পাঁচটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করা হলেও, তেমন ইতিবাচক ফলাফল আসেনি। কার্যত সৌদি আরব, মালয়েশিয়া ও কুয়েতের শ্রমবাজার এখনও বন্ধ রয়েছে আমাদের জন্য। বাংলাদেশের জনশক্তির সবচেয়ে বড় বাজার হিসেবে পরিচিত সৌদি আরবে এখন শ্রমিকরা যাওয়ার বদলে দেশে ফিরছে বেশি। ১৯৯৭ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত প্রতিবছর গড়ে দেড় থেকে দুই লাখ শ্রমিক সৌদি আবরে গেলেও গত সোয়া তিন বছরে সেখানে গিয়েছে মাত্র ৩৪ হাজার বাংলাদেশী, আর ফিরেছে ৫০ হাজারের বেশি (ইত্তেফাক. ১৯ জুন, ২০১২)। তবে জনশক্তি রপ্তানির হার কমলেও, রেমিটেন্সের পরিমাণ বেড়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী, ২০১১-১২ অর্থ বছরে প্রবাসিদের পাঠানো অর্থের পরিমাণ ১০.৮৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১১,৭৬৬.৯২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে (জনকণ্ঠ, ১ জুলাই ২০১২)। |
| বিশ্বমন্দার প্রভাব থেকে বাংলাদেশকে রক্ষার জন্য | তথ্য ভান্ডার গড়ে তোলা এবং কোনো টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে বলে আমরা শুনিনি। তবে সরকারের পক্ষ থেকে রপ্তানীখাতের জন্য প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা এবং সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু বিশ্বমন্দার কারণে বিদেশে কর্মরত যে |

| অঙ্গীকার | বাস্তবায়নের অগ্রগতি/ব্যর্থতা |
|---|---|
| তথ্য ভাণ্ডার গড়ে তোলা ও একটি টাস্কফোর্স গঠন করা হবে। | সকল শ্রমিক চাকুরি হারিয়ে দেশে ফিরে এসেছে, তাদেরকে কোনোরূপ সহায়তা প্রদান করা হয়নি। |
| **২ দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা** | |
| দুর্নীতি দমন কমিশনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করে কমিশনকে শক্তিশালী করা। | ২০১১ সালের ২৪ জানুয়ারি মন্ত্রী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত দুদক আইনের সংশোধিত খসড়ায় সরকারি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে মামলা করার ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমতি গ্রহণে বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি এবং মিথ্যা মামলার ক্ষেত্রে বাদীর ৫ বছরের জেল ও জরিমানার বিধান রাখা হয়েছিল। একইসঙ্গে দুদককে স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি না দেয়ার এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান তাদের গোপন তথ্য দুদককে প্রদান করতে বাধ্য না করার সুপারিশ করা হয়েছিল। দুদকের চেয়ারম্যান তাঁর প্রতিক্রিয়ায় বলেছিলেন যে, প্রতিষ্ঠানটিকে নখ-দন্তহীন বাঘে পরিণত করার প্রচেষ্টা চলছে। অবশ্য পরবর্তীকালে আইন সংশোধনের ক্ষেত্রে সরকারি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে মামলা করার ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমতি গ্রহণে বাধ্যবাধকতা সৃষ্টির বিষয়টি বাদ দেয়া এবং দুর্নীতি মামলার যে কোন আসামিকে গ্রেফতারের ক্ষমতা দুদককে দেয়া হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে (*দৈনিক যুগান্তর*, ২০ মার্চ ২০১২) – যদিও অদ্যাবধি সংশোধিত আইনটি পাস হয়নি। এছাড়াও দুর্নীতি দমনে দুদকের কার্যকর কোন ভূমিকা লক্ষ্য করা যায় না। |
| ক্ষমতাধরদের বার্ষিক সম্পদ বিবরণ প্রকাশ করা (দিনবদলের সনদে এই অঙ্গীকার দুইবার করা হয়েছে)। | নির্বাচন পরবর্তীকালে বারবার অঙ্গীকার করা সত্ত্বেও, মাননীয় অর্থমন্ত্রী ছাড়া গত সাড়ে তিন বছরে ক্ষতাধরদের কেউই সম্পদের হিসাব দাখিল করেননি। এছাড়াও বেশ কয়েকজন সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে যে, তাঁরা তাঁদের পদকে কাজে লাগিয়ে সরকারের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্কে লিপ্ত হয়ে অর্থকড়ি বানাচ্ছেন. যার ফলে তাঁরা সংশোধিত *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ* ১৯৭২ অনুযায়ী সংসদ সদস্য থাকার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছেন। প্রধান বিরোধী দল তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে সম্পদের হিসাব প্রদানের অঙ্গীকার ব্যক্ত করলেও, তারাও তা রক্ষা করেনি। |
| রাষ্ট্র ও সমাজের সকল স্তরের ঘুষ, দুর্নীতি উচ্ছেদ করা। | একটি বিশেষ সংসদীয় কমিটির তদন্তের ভিত্তিতে সংসদের সাবেক স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার ও চীফ হুইপের দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত হলেও সংসদের মর্যাদাহানির অভিযোগে তাঁদের বিরুদ্ধে কোনোরূপ ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। উল্লেখ্য যে, এমন অপরাধের কারণে প্রতিবেশি ভারতসহ অন্যান্য দেশে সংসদ থেকে বহিস্কারের বহু নজির রয়েছে।<br>বর্তমান সরকারের আমলে বড় ধরনের একজন দুর্নীতিবাজের শাস্তি হয়েছে বলেও আমরা শুনিনি, যদিও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। বরং দুর্নীতির অভিযোগে শাস্তিপ্রাপ্তরা গণহারে মুক্তি পেয়েছে। এ ব্যাপারে সরকার ও আদালতের ভূমিকা নিয়ে অনেক নাগরিকের মনে অনেক গুরুতর প্রশ্ন রয়েছে। ঘুষ প্রদান ও গ্রহণের সংস্কৃতি পুরোদমেই অব্যাহত রয়েছে।<br>পদ্মা সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে ঠিকাদার নিয়োগের ক্ষেত্রে সাবেক যোগাযোগ মন্ত্রী ও কয়েকজন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাংক কর্তৃক দুর্নীতির অভিযোগ উত্থাপন করা হলেও, তাদের দুর্নীতির সুষ্ঠু তদন্ত করা হয়নি।<br>অপরদিকে, গত ১৭ এপ্রিল, ২০১২ তারিখে বাংলাদেশ রেলওয়ের অর্থ কেলেংকারীর দায় নিয়ে রেলমন্ত্রী জনাব সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত পদত্যাগ করলেও, তার বিরুদ্ধে অভিযোগের সঠিক তদন্ত ও বিচার হয়নি। বরং তাঁকে দপ্তরবিহীন মন্ত্রী করা হয়েছে, যা সরকারের দুর্নীতিবিরোধী অঙ্গীকারের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। |
| চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, কালোটাকা ও পেশীশক্তি প্রতিরোধ ও নির্মূলে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ। | চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজির বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী ও সরকারী উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিরা বারবার কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে আসছেন। কিন্তু দলীয় পৃষ্ঠপোষকতায় এগুলোর লাগামহীন বিস্তার ঘটেছে।<br>গত সাড়ে তিন বছরে সরকারি দলের অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনগুলোর (যদিও ছাত্রলীগ ও শ্রমিকলীগকে অঙ্গ/সহযোগী সংগঠন হিসেবে অস্বীকার করা হয়) চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, দখলদারিত্ব ইত্যাদি অসহনীয় পর্যায়ে পৌঁছেছে। বিশেষ করে টেন্ডারবাজি নিয়ে ক্ষমতাসীন দলের মধ্যে আভ্যন্তরীণ কোন্দল বেড়েই চলেছে। সর্বশেষ ১২ জুন ২০১২ তারিখে সড়ক ভবনে টেন্ডার নিয়ে গোলাগুলি ও আহত হওয়ার ঘটনা জনমনে ব্যাপক আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে। সকল উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আজ ছাত্রলীগের কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছে। *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধিত) আইন, ২০০৯*-এর বিধান অনুযায়ী নিবন্ধিত দলের অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠন থাকা বেআইনী হলেও, এ ব্যাপারে কোনো উদ্যোগই গ্রহণ করা হয়নি।<br>২০১২-১৩ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে কালো টাকাকে সাদা করার ঢালাও সুযোগ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ক্ষমতাসীনদের সঙ্গে সম্পৃক্তদের কারসাজির কারণে পুঁজিবাজারে লুণ্ঠনকারীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এছাড়া ১০ শতাংশ হারে জরিমানা দিয়ে যে কোনো খাতে কালো টাকা সাদা করার বিধান সম্প্রতি সংসদে পাশ হয়েছে। |
| প্রতি দফতরে নাগরিক সনদ স্থাপন। | অনেক প্রতিষ্ঠানেই নাগরিক সনদ প্রকাশ করা হলেও, এর কার্যকারিতা নেই বললেই চলে। কারণ নাগরিক সনদে উল্লেখিত সেবা দেওয়া না হলে তার প্রতিকারের কিংবা শাস্তি প্রদানের কোনো ব্যবস্থা নেই। তারপরেও বলা যায় উদ্যোগটি ভালো। |
| সরকারি কর্মকাণ্ডের ব্যাপকভাবে কম্পিউটারায়ন করে দুর্নীতির পথ বন্ধ করা হবে। | ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়া সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার হলেও, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দুর্নীতি উচ্ছেদের ব্যাপক কোনো উদ্যোগ দেখা যায় না, যদিও টেন্ডার প্রক্রিয়া একটি সীমিত আকারে ব্যবহৃত হচ্ছে বলে শোনা যায়।<br>আশার বিষয়, মামলা ব্যবস্থাপনায় গতিশীলতা আনতে ও তদারকি বাড়াতে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ই-রেজিস্টারিং পদ্ধতি চালু করেছে সুপ্রিম কোর্ট। আরও আশার কথা যে, সরকারের A2I প্রকল্পের অধীনে দেশের সকল ইউনিয়নে ওয়েব পোর্টাল সৃষ্টি করা হয়েছে, যা ভবিষ্যতে কাজে লাগাতে হবে। |

| অঙ্গীকার | বাস্তবায়নের অগ্রগতি/ব্যর্থতা |
|---|---|
| **৩ বিদ্যুৎ ও জ্বালানী সমস্যা নিরসনে উদ্যোগ গ্রহণ** | |
| বিদ্যুৎ ও জ্বালানী সমস্যা সমাধানে একটি দীর্ঘমেয়াদী সমন্বিত সার্বিক জ্বালানি নীতিমালা গ্রহণ করা হবে। পুরনো বিদ্যুৎ কেন্দ্র মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও ওভারহোলিংয়ের ব্যবস্থা করে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি করা হবে। আগামী তিন বছরে অর্থাৎ ২০১১ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন ৫ হাজার মেগাওয়াটে, ২০১৩ সালের মধ্যে ৭ হাজার মেগাওয়াটে এবং ২০২১ সালে ২০ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত করা হবে। | সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের সময়ে বিদ্যুতের সর্বোচ্চ উৎপাদন ক্ষমতা ছিল আনুমানিক ৪০০০ মেগাওয়াট। সরকারি হিসাব মতে, দায়িত্ব গ্রহণের পর এ পর্যন্ত ১১৩১ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হয়েছে। তবে গ্যাসের অভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা পুরোপুরি কাজে লাগানো যাচ্ছে না। ফলে এখনও লোড শেডিং অব্যাহত রয়েছে।<br>বিদ্যুতের চাহিদা মেটানোর জন্য সরকার ২০০৯ সালে তেলভিত্তিক রেন্টাল, কুইক রেন্টাল এবং পিকিং প্লান্ট নামের তিন ধরনের প্রকল্প গ্রহণ করে। এসব প্রকল্পে চড়া দামে আমদানীকৃত তেল ভর্তূকির মাধ্যমে সরবরাহ করে উৎপাদন শেষে আবার চড়া দামে বিদ্যুৎ ক্রয় করার বিধান রয়েছে। এসব বিধানরে ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে সরকারের ওপর আর্থিক চাপ প্রবল থেকে প্রবলতর হতে থাকে। অন্যদিকে এসব বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ না কিনলে সরকারকে প্রতি মাসে প্রতি মেগাওয়াট বিদ্যুতের জন্য ৯ থেকে ৩০ হাজার ডলার 'ক্যাপাসিটি বিল্ডিং চার্জ' হিসেবে প্রদান করতে হয়। এ খাতে গত বছর সরকারকে ১২টি রেন্টাল এবং ১৫টি কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রকে দুই হাজার ৬৯৭ কোটি টাকা দিতে হয়েছে, বর্তমান বছরে যা দাঁড়াবে তিন হাজার ১২২ কোটি টাকাতে। এর সঙ্গে তেলের মূল্যের ভর্তূকি যোগ করলে সরকারের ওপর আর্থিক চাপ ব্যাপক আকার ধারণ করে। এ চাপের ফলেই সরকারকে সম্প্রতি আইএমএফের কাছ থেকে ১০০ কোটি ডলার সহায়তা নিতে হয়েছে (দি ফাইনান্সিয়াল এক্সপ্রেস, ১৬ মে ২০১২)।<br>বিশেষজ্ঞদের মতে, কুইক রেন্টাল পদ্ধতি আমাদের জ্বালানী সংকটের সঠিক ও স্থায়ী সমাধান নয়। গত ৯ এপ্রিল ওয়ার্কার্স পার্টি আয়োজিত এক আলোচনা সভায় এমনকি বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজসম্পদ বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি মেজর জেনারেল (অব) সুবিদ আলী ভূঁইয়া বলেছেন, বিদ্যুৎ ও জ্বালানী খাত নিয়ে আমাদের সরকারের নেয়া সিদ্ধান্ত ভুল প্রমাণিত হয়েছে। দ্রুত বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধানের যে পরিকল্পনা নেয়া হয়েছিল তা ব্যর্থ হয়েছে। ভুল সিদ্ধান্তের কারণে বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধান তো হলোই না, বরং রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অবস্থাও খারাপ হয়েছে (আমার দেশ, ১০ এপ্রিল, ২০১২)। দৈনিক প্রথম আলোতে প্রকাশিত 'বিদ্যুতের কৃত্তিম সংকটে বাংলাদেশ' ইতিমধ্যে সরকারও স্বীকার করেছে যে রেন্টাল/কুইক রেন্টাল পাওয়ার প্ল্যান্ট বাবদ টাকা খরচ করতে গিয়ে রাষ্ট্রীয় কোষাগার খালি হযে গেছে। আর তাই তারা পুরোনো ১৫টি প্ল্যান্টের ২৬টি ইউনিট মেরামত করার সিদ্ধান্তে এসেছে। (প্রথম আলো, ৭ জুলাই, ২০১২)<br><br>উল্লেখ্য যে, *বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন* ৩ অক্টোবর ২০১০ সংসদে পাশ হয়েছে। ফলে সরকার বিদেশ থেকে বিদ্যুৎ বা জ্বালানীর আমদানি ও তা সরবরাহ করতে পারবে। এই কার্যক্রমের সাঙ্গে সংশ্লিষ্টদের দায়মুক্তিও দেয়া হয়েছে। এ ধরনের দায়মুক্তির ফলে সরকারি ক্রয়খাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা ইতোমধ্যেই প্রশ্নবিদ্ধ হওয়া শুরু হয়েছে। |
| তেল ও নতুন গ্যাসক্ষেত্র অনুসন্ধান ও আহরণের কাজে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। দেশের উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলে গ্যাস সরবরাহের ব্যবস্থা করা হবে। গ্যাস ও এলপিজি'র সরবরাহ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করা হবে। | অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতা অনুযায়ী, দেশে গ্যাসের বর্তমান চাহিদা ২ হাজার ৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট হলেও, ২৩টি গ্যাসক্ষেত্রের মধ্যে ১৭টি গ্যাসক্ষেত্র থেকে দৈনিক গ্যাস উত্তোলনের পরিমাণ ২ হাজার মিলিয়ন ঘনফুট। উল্লেখ্য যে মৌলভীবাজারের রশীদপুরে ১ ট্রিলিয়ন ঘনফুট গ্যাসের এবং গত বছর বাপেক্স নোয়াখালী জেলার কোম্পানীগঞ্জের সুন্দলপুরে ১টি গ্যাসক্ষেত্র আবিস্কৃত করলেও, গ্যাস উত্তোলনের ক্ষেত্রে তেমন কোন পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে বলে আমরা শুনিনি। এছাড়া খাগড়াছড়ির সেমুতাং গ্যাসক্ষেত্রের ৫ নং কূপ থেকে ২০০৯ সালে দৈনিক ২০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উত্তোলনের লক্ষ্যে কাজ চলছে।<br>২০১১ সালে বাংলাদেশ সরকার যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক কোম্পানি কনোকো ফিলিপসের সঙ্গে তৃতীয় পক্ষের কাছে বিক্রির সুযোগ রেখে গভীর সমুদ্রে তেল ও গ্যাস খননের চুক্তি করে, যা জনমনে ব্যাপক বিরুপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে।<br>মিয়ানমারের সাথে সমুদ্রসীমা নিয়ে বিরোধ অবসানের পর দেশের সমুদ্রসীমায় তেল-গ্যাসক্ষেত্র আরও কিছুটা বিস্তারের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।. |
| জাতীয় স্বার্থকে সমুন্নত রেখে কয়লানীতি প্রণয়ন করা হবে। এ যাবৎ প্রাপ্ত কয়লার অর্থনৈতিক ব্যবহার এবং কয়লাভিত্তিক নির্মাণে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হবে। নতুন কয়লা ও অন্যান্য খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান ও আহরণে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। | দেশীয় কয়লা তোলার জন্য সরকার কর্তৃক 'জাতীয় কয়লা নীতি' প্রণয়নের ঘোষণা দেয়া হলেও, এখনও তা হয়নি। দেশে এ পর্যন্ত আবিস্কৃত ৫টি খনি থেকে মোট কয়লা মজুদের পরিমান প্রায় ৩০০ কোটি (৩ বিলিয়ন) টন, যা অতি উন্নত মানের বিটুমিনাস কয়লা। এই কয়লা দিয়ে ৫০ বছর ধরে ১০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব, যদিও এমন দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অভাব রয়েছে। সরকারের ২০১৫ নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনায় প্রায় ২৬০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের কথা বলা হয়েছে, যে কয়লা প্রাথমিকভাবে আমদানি করা হবে। আমাদের দেশীয় মজুদ থেকে কয়লা উত্তোলন করে ব্যবহার না করার সিদ্ধান্ত অনেকের কাছেই বোধগম্য নয়। |
| **৪ দারিদ্র্য ঘুচাও বৈষম্য রুখো** | |
| দারিদ্র্য বিমোচনের প্রধান | একটি গবেষণায় দেখা যায়, ২০০০ সালে দেশে দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করত ৪৮ দশমিক ৯ শতাংশ মানুষ। ২০১০ সালে |

| অঙ্গীকার | বাস্তবায়নের অগ্রগতি/ব্যর্থতা |
|---|---|
| কৌশল হবে কৃষি ও পলণ্টী জীবনে গতিশীলতা। হতদরিদ্রের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী বিস্তৃত করা হবে। ২০১৩ সালের মধ্যে দারিদ্র্যসীমা ও চরম দারিদ্র্যের হার যথাক্রমে ২৫ ও ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনা হবে। বর্তমানের ৬.৫ কোটি দরিদ্রের সংখ্যা ২০১৩ সালে হবে ৪.৫ কোটি এবং ২০২১ সালে হবে ২.২ কোটি। এই লক্ষ্য পূরণের জন্য অন্যান্য পদক্ষেপের সঙ্গে বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে। বয়স্ক ভাতা, দুস্থ মহিলা ভাতা, সুবিধাভোগিদের সংখ্যা কমপক্ষে দ্বিগুণ করা হবে।বর্তমান দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র পুনর্মূল্যায়ন করে নতুন পিআরএসপি প্রণয়ন করা হবে। বেকারের সংখ্যা ২০০৮ সালের ২.৮ কোটি থেকে ২০১৩ সালে ২.৪ কোটিতে নামিয়ে আনা হবে। | তা কমে দাড়িয়েছে ৩১.৫ শতাংশ। নিু দারিদ্র্য সীমারেখা ব্যবহার করে দেখা যায়, ২০০০ সালে দারিদ্র্যের হার ছিল ৩৪.৩ শতাংশ। ২০১০ সালে তা কমে দাড়িয়েছে ১৭ দশমিক ৬ শতাংশ। তবে এ উপাত্ত নিয়ে অনেকের মনেই সন্দেহ রয়েছে, যেমনি রয়েছে আমাদের জনসংখ্যার তথ্য নিয়ে। এছাড়াও বর্তমানে ব্যবহৃত এক ডলার ২৫ সেন্ট দৈনিক আয়কে দারিদ্র্য সীমারেখা হিসেবে ধরে নেওয়া হয়, যা একটি কৃত্তিম পরিমাপক। উপরন্তু, গত কয়েক বছরের দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির কারণে কত শতাংশ নিম্নবিত্ত মানুষ যে এই কৃত্তিম দারিদ্র্যসীমার নীচে নেমে গেছে সে সম্পর্কে কোন তথ্য নেই। আর দারিদ্র্যের হার কমলেও দরিদ্রের সংখ্যা কত কমেছে সে বিষয়ে অনেকের মনে প্রশ্ন রয়েছে।<br>কৃষিকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে, ফলে কৃষি উৎপাদন বেড়েছে। স্বল্পসুদে, সহজ শর্তে ও সহজে কৃষকদের ঋণ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে ১০ টাকার বিনিময়ে কয়েক লক্ষ কৃষক পরিবারের মধ্যে কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড বিতরণ করা হয়েছে এবং ৯২ লক্ষ বর্গাচাষীকে ডিজেল ক্রয়ে সহায়তা বাবদ ৭৫০ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। সরকারি-বেসরকারিখাতে কৃষি ঋণ বিতরণের পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়েছে।<br>সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর পরিধি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে। এখাতে জিডিপি'র প্রায় দুই-শতাংশ ব্যয় করা হচ্ছে। কিন্তু ইউনিয়ন পরিষদ আইন অনুযায়ী, এ সকল কর্মসূচীর উপকারভোগী কতগুলো পুনর্নির্ধারিত মানদণ্ডের ভিত্তিতে (যেমন, প্রতিবন্ধী, ভূমিহীন, স্বামী পরিত্যক্তা ইত্যাদি) প্রকাশ্য ওয়ার্ডসভার মাধ্যমে স্বচ্ছতার ভিত্তিতে নির্ধারিত হওয়ার কথা থাকলেও, অধিকাংশ মন্ত্রণালয়েই প্রজ্ঞাপন জারি করে বিভিন্ন কমিটির মাধ্যমে, অনেকক্ষেত্রে দলীয় ব্যক্তিদের মাধ্যমে তা করে থাকে। ফলে এ সকল কর্মসূচীতে ব্যাপক দুর্নীতি ও অপচয় বিরাজমান, যে কারণে সাধারণ জনগণ এগুলোর পূর্ণ সুফল থেকে বঞ্চিত হয়। আর সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর কর্মসূচীর মাধ্যমে স্থায়ী ও টেকসইভাবে দারিদ্র্য দূরীকরণ সম্ভব নয়। এ জন্য প্রয়োজন হবে ন্যায়পরায়ণতার চর্চা এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদে সাধারণ জনগণের বঞ্চনার অবসান, যে উদ্যোগ আমাদের কোন সরকারই এ পর্যন্ত নেয়নি। ফলে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য আমাদের দেশে আকাশচুম্বী, যা আমাদেরকে এক অসম সমাজে পরিণত করেছে।<br>নুতন পিআরএসপি প্রণয়ন করা হয়নি এবং বেকারের সংখ্যাও কমেনি।<br>কৃষি ও পল্লী জীবনে গতিশীলতা আনয়নের জন্য ব্যাপক বিকেন্দ্রীকরণ ও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা প্রয়োজন। কিন্তু স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা আমাদের দেশে ক্রমাগতভাবে দুর্বল হয়েছে, বর্তমান সরকারের আমলেও তা অব্যাহত রয়েছে। |
| **৫ সুশাসন প্রতিষ্ঠা** | |
| সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ শক্ত হাতে দমন করা হবে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ব্যবস্থা করা হবে। | যুদ্ধাপরাধ/মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের বিচার প্রক্রিয়া দুইটি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে শুরু হয়েছে। আমরা আশা করি যে, এ বিচার দ্রুত ও সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতার সাথে সম্পন্ন হবে, যার মাধ্যমে আমাদের জাতির ইতিহাস থেকে একটি কলঙ্কজনক অধ্যায়ের অবসান ঘটবে।<br>জঙ্গীবাদ দমনে কঠোরতা প্রদর্শন করা হচ্ছে, যা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। তবে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণে সরকারের সফলতা দৃশ্যমান নয়। বিশেষত ছাত্রলীগের সন্ত্রাস বন্ধে সরকারের ভূমিকা হতাশাজনক। |
| বিচার বিভাগের প্রকৃত স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা হবে। | কাগজে-কলমে বিচার বিভাগ স্বাধীন হলেও অনেক ক্ষেত্রে এখনও আইন মন্ত্রণালয়ের উপর নির্ভরশীল বিচার বিভাগ। অতীতের ন্যায় যোগ্যতা বিবেচনা না করে দলীয় অনুগতদেরকেই বিচার বিভাগে নিয়োগ প্রদানের প্রক্রিয়া এখনও অব্যাহত রয়েছে। প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে জেষ্ঠ্যতা লঙ্ঘন করা হয়েছে বার বার। আপিল বিভাগে নিয়োগের ক্ষেত্রেও একই ধারা বিদ্যমান রয়েছে। |
| বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ড বন্ধ করা। | বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ড বন্ধে সরকারের প্রতিশ্রুতি থাকলেও এমন মানবতাবিরোধী ঘটনা ঘটেই চলেছে যা দেশে বিদেশে বাংলাদেশের ইমেজকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। 'আইন ও সালিশ কেন্দ্রে'র তথ্য অনুযায়ী, ২০১১ থেকে ২০১২ সালের মার্চ পর্যন্ত ক্রসফায়ার, বন্দুকযুদ্ধ বা এনকাউন্টারের নামে দেশে ১৩৫টি বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ড ঘটেছে। 'অধিকারের রেকর্ড অনুযায়ী, গত সোয়া তিন বছরে ৪০৩ জন বিচারবর্হিভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন। এ নিয়ে সম্প্রতি হিউম্যান রাইটস ওয়াচ উদ্বেগ প্রকাশ এবং র‍্যাব বন্ধ করার সুপারিশ করেছে, যা নিয়ে তারা ব্যাপক সমালোচনার সম্মূখীন হয়েছে।<br>মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে যথাযথ উদ্যোগ নিতে ব্যর্থ হয়েছে। সম্প্রতি ঘটে |

| অঙ্গীকার | বাস্তবায়নের অগ্রগতি/ব্যর্থতা |
|---|---|
| | যাওয়া বিএনপি'র নেতা ইলিয়াস আলী নিখোঁজের ঘটনা তদন্তে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে। একইসঙ্গে ব্যর্থ হয়েছে সাংবাদিক দম্পতি সাগর-রুনি এবং সৌদি দূতাবাসের কর্মকর্তা হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদ্ধারে। |
| বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের রায় কার্যকর ও জেলখানার চার নেতার হত্যাকাণ্ডের পুনর্বিচার। | জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকারীদের বিচার শেষ হয়েছে এবং বিচারের রায় আংশিকভাবে কার্যকর করা হয়েছে। এখনও পলাতকদের দেশে ফিরিয়ে আনা যায়নি। জেল হত্যা মামলার পুনর্বিচার এখনও শুরু হয়নি। |
| ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলার সুষ্ঠু তদন্ত ও অপরাধীদের বিচারের ব্যবস্থা। | বহুল আলোচিত ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলার তদন্ত চলছে। তারেক রহমানসহ ১৯ জনের বিরুদ্ধে আসামি করে মামলা দায়ের করা হয়েছে। |
| আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা | আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করার অঙ্গীকার করা হলেও তা বাস্তবায়নে সরকার সফলতা প্রদর্শন করতে পারেনি। বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ড অবাধে চলছে। একইসঙ্গে দলীয় বিবেচনায় অনেক অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না। দলীয় বিবেচনায় এবং রাজনৈতিক হয়রানী অজুহাতে চার দলীয় জোট সরকারের পদাংক অনুসরণ করে প্রায় সাত সহস্রাধিক মামলা বর্তমান সরকার প্রত্যাহার করেছে – যার মধ্যে হত্যা এবং বর্তমান সরকার আমলে দায়ের করা মামলাও রয়েছে। মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক খুনের মামলার ফাঁসির আসামীর দন্ডাদেশ মওকুফের ঘটনাটি আইনের শাসনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। শেয়ার বাজার কেলেঙ্কারিতে জড়িতদের বিরুদ্ধে অদ্যাবধি কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। বেশ কয়েকজন মাননীয় সংসদ সদস্য মিথ্যা হলফনামা দিয়ে রাজউকের প্লটের জন্য দরখাস্ত করেছেন, যা একটি দন্ডনীয় অপরাধ। আরো কয়েকজন সংসদ সদস্য কার্যপ্রণালী বিধি লঙ্ঘন করে সংসদীয় কমিটির সদস্য হয়েছেন। একজন সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। এদের কারোর বিরুদ্ধেই কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি এবং ক্ষমতাধররা এখনও আইনের উর্ধ্বেই থেকে যাচ্ছে, যা আইনের শাসনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এমনকি আমাদের মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যানও সম্প্রতি বলেছেন যে, দেশে এখন আইনের শাসন নেই (মানবজমিন, ৯ জুলাই ২০১২)। |
| স্বাধীন মানবাধিকার কমিশন গঠন ও ন্যায়পাল নিয়োগ করা। | স্বাধীন মানবাধিকার কমিশন গঠন করা হলেও শুধুমাত্র ভালো ভালো বক্তব্য রাখা ছাড়া মানবাধিকার পরিস্থিতির তেমন কোন অগ্রগতি হয়নি। কমিশনে জনবলের সংকট রয়েছে। কমিশনের নিয়োগ প্রক্রিয়াও স্বচ্ছ ছিল না। এখনও ন্যায়পাল নিয়োগ করা হয়নি। |
| জাতীয় সংসদ কার্যকর ও সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। | জাতীয় সংসদ জাতীয় অগ্রগতি ও সমস্যা সমাধানের কেন্দ্রবিন্দুতে রূপান্তরিত করার আকাঙ্ক্ষা থাকলেও তা পূরণ হয়নি। সংসদ সদস্যদের অনেকেই সংসদীয় কাজে বিমূখ – অনেকেই ব্যবসা-বাণিজ্য এবং স্থানীয় উন্নয়ন কাজে নিজেদেরকে ব্যস্ত রাখছেন। সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সৃষ্ট সংসদীয় কমিটি অনেকক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় এবং কিছু কমিটি তার এখতিয়ার বহির্ভূত মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণে লিপ্ত। কিছু স্পর্শকাতর বিষয় সম্পর্কিত (যেমন, ছাত্র রাজনীতি, দলীয়করণ, শেয়ার বাজার কেলেঙ্কারি ইত্যাদি) সংশ্লিষ্ট কমিটিগুলো নিরব। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সংসদীয় কমিটির চেয়ারম্যানদের সাথে একাধিকবার বৈঠক করে তাদেরকে সরকারের সমালোচনা করার ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করেছেন।<br>অতীতের ন্যায় এবারও বিরোধী দল সংসদ বর্জন করছে এবং নিয়মতান্ত্রিক পথের পরিবর্তে তারা রাজপথেই সমস্যা সমাধানের পথ অবলম্বন করেছে। বলা বাহুল্য যে, রাজপথে সমস্যার সমাধান হয় না, বরং তা ব্যাপক ও প্রকট আকার ধারণ করে এবং সহিংস রূপ নেয়। এমন আচরণ আমাদের নির্বাচনসর্বস্ব গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক নয়। |
| নির্বাচন কমিশন এবং নির্বাচন পদ্ধতির চলমান সংস্কার অব্যাহত থাকবে। | নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সংস্কার প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা হয়নি। বরং হয়েছে তার উল্টো। যেমন, সংশোধিত *গনপ্রতিনিধিত্ব আদেশ* ১৯৭২ সংসদে অনুমোদনের সময় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নের ক্ষেত্রে দলের তৃণমূল কমিটির ক্ষমতাগুলো খর্ব করা এবং 'না' ভোটের বিধান বাদ দেওয়া হয়েছে।<br>তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি তুলে দিয়ে নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী করার কথা বলা হলেও গত নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত সংস্কার প্রস্তাব সরকার আমলে নেয়নি। বরং পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান সংবিধান থেকে বাদ দিয়ে এবং সংসদের মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার আগেই নির্বাচনের বিধান সংযোজন করে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনই অনিয়শ্চতার মধ্যে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। তবুও কোন ধরনের সংস্কার না করে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব বলে মনে করছে বর্তমান নির্বাচন কমিশন। এছাড়াও সুষ্ঠু নির্বাচন সম্পাদনের জন্য কমিশন যথেষ্ট শক্তিশালী বলে তারা দাবি করেছে, যা অনেককেই হতবাক করেছে। |
| রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নিষিদ্ধ করা হবে। ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা ও অধিকার নিশ্চিত করা হবে। | রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নিষিদ্ধ করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানে একযোগে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলা হয়েছে এবং ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও আদিবাসীদেরকে এখনও সাংবিধানিক স্বীকৃতি থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। |
| একটি সর্বসম্মত আচরণ | একটি সর্বসম্মত আচরণ বিধিমালা প্রণয়নের ব্যাপারে মাননীয় সংসদ সদস্য সাবের হোসেন চৌধুরী কর্তৃক একটি আইনের |

| অঙ্গীকার | বাস্তবায়নের অগ্রগতি/ব্যর্থতা |
|---|---|
| বিধিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। | খসড়া সংসদে উত্থাপন এবং সংশ্লিষ্ট সংসদীয় কমিটি আইনে পরিণত করার সুপারিশ করলেও, সরকারের পক্ষ থেকে এ লক্ষ্যে কোনো উদ্যোগই পরিলক্ষিত হচ্ছে না। |
| প্রবাসী বাঙালিদের ভোটাধিকার প্রদান ও রেমিটেন্সের বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি | ইতোমধ্যেই প্রবাসী বাঙালিদের ভোটাধিকার প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। রেমিটেন্সের বিনিয়োগ এবং প্রবাসী মূলধনকে আকৃষ্ট করার বিশেষ উদ্যোগ হিসেবে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। |
| দলীয়করণমুক্ত অরাজনৈতিক গণমুখী প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করা হবে। যোগ্যতা, জ্যেষ্ঠতা ও মেধার ভিত্তিতে সব নিয়োগ ও পদোন্নতি নিশ্চিত করা হবে। প্রশাসনিক সংস্কার, তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং ইগভর্নেন্স চালু করা হবে। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য স্থায়ী বেতন কমিশন গঠন করা হবে। | চারদলীয় জোট সরকারের অনুসরণে প্রশাসনে চরম দলীয়করণ চলছে এবং প্রশাসনকে গণমূখী করার লক্ষ্যে সংস্কারের কথা শোনা গেলেও অদ্যাবধি কোনো অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়নি। যোগ্যতা, জেষ্ঠ্যতা ও মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ ও পদোন্নতি না দিয়ে দলীয় দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। ফলে প্রশাসনে এক ধরনের বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছে। প্রশাসন ক্রমান্বয়ে মেধাশূণ্য হয়ে যাচ্ছে এবং অযোগ্য ও অদক্ষরা পুরস্কৃত হচ্ছে।<br>অনেক আগেই তথ্য অধিকার আইন পাস হয়েছে। তবে আইনটিকে পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়নের জন্য তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায় না। ডিজিটাল বাংলাদেশ সৃষ্টির ব্যাপারে সরকারের ব্যাপক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, ই-গভর্নেন্স চালুর উদ্যোগ যথেষ্ট নয়। অধিকাংশ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে নিয়মিত তথ্য আপডেটই করা হয় না। |
| আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসমূহকে রাজনীতির প্রভাবমুক্ত, আধুনিক ও যুগোপযোগী করে গড়ে তোলা হবে। তাদের বেতন-ভাতা, আবাসন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হবে। | আজ পর্যন্ত পুলিশ সংস্কারের কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি। পুলিশ ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে আগের মতোই দলীয় ও রাজনৈতিক স্বার্থে এবং বিরোধীদের শায়েস্তা করার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বেতন-ভাতা, আবাসন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির উদ্যোগ অদ্যাবধি নেয়া হয়নি। কিন্তু পুলিশ বাহিনী কর্তৃক ভালো সেবা নিশ্চিত করার অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে তাঁদের বেতন-ভাতা, আবাসন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা। |
| রংপুর নতুন বিভাগ গঠন করা হবে | রংপুরকে বিভাগ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে রংপুর সিটি কর্পোরেশনও ঘোষণা করা হয়েছে। |
| **৬. স্থানীয় সরকার** | |
| ক্ষমতার বিকেন্দ্রায়ন করে ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পরিষদকে শক্তিশালী করা। | ক্ষমতার বিকেন্দ্রায়নের কোনো উদ্যোগই পরিলক্ষিত হয় না। বরং সকল দলীয় ও সরকারি ক্ষমতা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়ার প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে। গণতন্ত্রের অন্যতম ভিত্তি হলো স্থানীয় সরকার যা দূর্বল থেকে দূর্বলতর হচ্ছে, যার অন্যতম উদাহরণ হচ্ছে যথাসময়ে ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়া।<br>সংসদ সদস্যদেরকে উপজেলা পরিষদের উপদেষ্টা এবং উপদেষ্টার পরামর্শগ্রহণ বাধ্যতামূলক করে পরিষদের ওপর তাঁদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যা স্থানীয় পর্যায়ে একটি চরম দ্বন্দ্বাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। সম্প্রতি মন্ত্রী পরিষদ উপজেলা পরিষদ আইন সংশোধন করে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদেরকে মূখ্য নির্বাহী করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা এ দ্বন্দ্বকে আরো প্রকট করবে। একইসাথে উপজেলার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অনাস্থা প্রস্তাবের ক্ষেত্রে সরকার তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছে। উপজেলা পরিষদ কার্যকর করার ক্ষেত্রে এসব পদক্ষেপ পর্বতপ্রমান বাধা।<br>জেলা পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের কোনো উদ্যোগই লক্ষ্য করা যায় না, যা সংবিধান ও আদালতের রায়ের লঙ্ঘন। এছাড়াও দলীয়ভাবে প্রশাসক নিয়োগ এ প্রতিষ্ঠানটিকে আরো অকার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে।<br>সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত ক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতি তথা চেকস এন্ড ব্যালেন্সেস পদ্ধতি উপেক্ষা এবং হাইকোর্টের *আনোয়ার হোসেন মঞ্জু বনাম বাংলাদেশ* মামলার রায় অমান্য করে স্থানীয় উন্নয়ন কাজে সংসদ সদস্যদের ব্যাপকভাবে জড়িত করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে তাঁদেরকে ১৫ কোটি টাকা সমপরিমাণের উন্নয়ন প্রকল্প সুপারিশের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। ফলে ভারতের পঞ্চায়েতীরাজের পরিবর্তে আমাদের দেশে 'এমপিরাজ' সৃষ্টির চেষ্টা চলছে।<br>ইউনিয়ন পরিষদকে সকল উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করার কোনো উদ্যোগই পরিলক্ষিত হয় না। সংসদ সদস্যদের পৃষ্ঠপোষকতায় দলীয় ব্যক্তিরা অনেকক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদকে অকার্যকর করে ফেলেছে।<br>এছাড়াও ঢাকা সিটি কর্পোরেশন দু'টি ভাগে বিভক্ত করা হলেও, মামলার কারণে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। |

**অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকারসমূহঃ**

**কৃষি ও পলণ্টী উন্নয়নঃ** সরকারের অঙ্গীকার হলো ২০১৩ সালের মধ্যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন। একই সাথে মাছ, দুধ, ডিম, মুরগী, গবাদিপশু ও লবণ উৎপাদনে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন করা। বর্গা চাষীদের ঋণদান, ক্ষেমজুরদের কর্মসংস্থান, তাদেরকে পল্লী রেশনের আওতায় আনা এবং ভূমি সংস্কার কমিশন গঠনও সরকারের অঙ্গীকারের অংশ। *খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের ক্ষেত্রে অনেকদূর এগিয়ে গেলেও, অন্য ক্ষেত্রগুলোতে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জিত হয়নি। ধান উৎপাদন বাড়লেও কৃষকরা ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত।* বর্গাচাষীদের জন্য ঋণের ব্যবস্থা করা হলেও, ক্ষেতমজুরদের কর্মসংস্থান ও তাদেরকে রেশনের আওতায় আনার কোন উদ্যোগ দেখা যায় নি। *ভূমি সংস্কার কমিশন গঠিত হয়নি।*

**পরিবেশ ও পানি সম্পদঃ** পরিবেশ সংরক্ষণ, বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাব থেকে সুরক্ষা, গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্প বাস্তবায়ন, ভু-উপরিস্থিত পানির যুক্তিসঙ্গত ব্যবহার, নিশ্চিত করার অঙ্গীকার দিনবদলের সনদের অংশ। *বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বৈদেশিক সাহায্য জোগাড়ের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দৌড়-ঝাপ অব্যাহত থাকলেও আভ্যন্তরীণ পরিবেশ রক্ষায় কার্যকর কোন সমন্বিত উদ্যোগ দৃশ্যমান নয়। পরিবেশ উন্নয়নের ব্যাপারেও তেমন কোনো উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায় না, বরং পাহাড় কাটা ও বন উজাড় করা অব্যাহত রয়েছে। গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্প বাস্তবায়ন, ভূ-উপরিস্থিত পানি ব্যবহারে কোন উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়নি।*

**শিল্প-বাণিজ্যঃ** পুঁজি বাজারের দ্রুত বিকাশ, আইনশৃঙ্খলা, ঘুষ-দুর্নীতি, প্রশাসনিক জটিলতা, রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতামুক্ত, বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি, জনশক্তি রপ্তানী বৃদ্ধি ও প্রবাসিদের প্রেরিত রেমিট্যান্সের উৎপাদনশীল বিনিয়োগ নিশ্চিত করাসহ এক্ষেত্রে আরো অনেকগুলো অঙ্গীকার করা হয়েছে। *কিন্তু বাস্তবে পুঁজিবাজার আজ ধ্বংসের মুখে, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি এবং প্রশাসনিক জটিলতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া কোন কিছুই ঘটে না, এমনকি ব্যাংক স্থাপন ও টেলিভিশন চ্যানেল চালুরও অনুমতি মিলে না। জনশক্তি রপ্তানীর হার হ্রাস পেয়েছে এবং তাদের রেমিট্যন্স উৎপাদনখাতে বিনিয়োগের কোন উদ্যোগ দেখা যায়নি।*

**শিক্ষা ও বিজ্ঞানঃ** শিক্ষাক্ষেত্রে অঙ্গীকারগুলেঅ হলো: নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা, ২০১০ সালের মধ্যে প্রাথমিক স্তরে নীট ভর্তি ১০০%, ২০১৪ সালের মধ্যে দেশকে নিরক্ষরমুক্ত করা, মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযুগি করা, শিক্ষাঙ্গনকে দলীয়মুক্ত করা, ২০১৩ সালে মাধ্যমিক স্তরে আইটি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা ইত্যাদি। *সরকারের বড় সফলতা একটি শিক্ষানীতি প্রণয়ন, যা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তেমন কোনো কার্যকর পদক্ষেপ এখনও দেখা যায় না। প্রাথমিক স্তরে ভর্তির ব্যাপারে অগ্রগতি ঘটলেও, নিরক্ষরমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার, মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার এবং মাধ্যমিক স্তরে আইটি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার বড় ধরনের কোন উদ্যোগ দেখা যায় না। সেশনজট অব্যাহত রয়েছে এবং শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ও দলীয় প্রভাব বেসামাল পর্যায়ে পৌঁছেছে। বস্তুত, দলের ছত্র-ছায়ায় ছাত্রলীগ ব্যাপক টেন্ডারবাজি ও চাঁদাবাজীতে লিপ্ত রয়েছে। বস্তুত, পুরো শিক্ষাঙ্গনই তাদের কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছে।*

**স্বাস্থ্যসেবা ও পরিবার কল্যাণঃ** এক্ষেত্রে অঙ্গীকারগুলো হলো: জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির পুনর্মূল্যায়ন করা, ১৮ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক চালু করা, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা, আর্সেনিক সমস্যার সমাধান করে ২০১১ সালের মধ্যে সবার জন্য সুপেয় পানি এবং ২০১৩ সালের মধ্যে প্রতি বাড়িতে স্যানিটেশনের ব্যবস্থা করা। *নতুন একটি স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কিছু কমিউনিটি ক্লিনিক চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হলেও নিয়মানুযায়ী সেগুলো চলছে না। আর্সেনিক সমস্যা সমাধানে এবং সুপেয় পানি নিশ্চিতকরণে উল্লেখযোগ্য কোন অগ্রগতি হয়নি। ২০১৩ সালের মধ্যে প্রতি বাড়িতে স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশনের ব্যবস্থা করা যাবে বলে মনে হয় না।*

**নারীর ক্ষমতায়নঃ** 'নারী উন্নয়ন নীতি' পূনর্বহালের ঘোষণা দেয়া হলেও, তাতে সাংবিধানিক চেতনার আলোকে নারীর সমঅধিকার নিশ্চিত করা হয়নি। জাতীয় সংসদে নারী আসন ৩৩ শতাংশ বৃদ্ধির কথা থাকলেও ৪৫ থেকে মাত্র ৫টি বাড়িয়ে ৫০টি করা হয়েছে। প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ে নারীদের পদায়ন করার চেষ্টা করা হচ্ছে। সংসদে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ আইন পাশ করা হয়েছে।

**যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামোঃ** পদ্মা ও কর্ণফুলী সেতু, টানেল নির্মাণ, ঢাকা-চট্টগ্রাম ৪ লেন বিশিষ্ট এক্সপ্রেস সড়ক নির্মাণে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং রেলপথ সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়নের প্রতিশ্রুতি থাকলেও দুর্নীতির অভিযোগে ইতোমধ্যেই বিশ্বব্যাংক ও এডিবি ঋণচুক্তি বাতিল করায় প্রকল্পটি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে – যদিও বিভিন্নভাবে অর্থ সংগ্রহসহ নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মানের ঘোষণা দিয়েছে সরকার। তবে আমরা অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে একমত যে, পদ্মাসেতু নির্মাণে আমাদের বৈদেশিক সাহায্য প্রয়োজন হবে। আশা করি যে, দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করে সরকার উন্নয়ন সহযোগিদের সঙ্গে নতুন করে আলোচনায় বসবে। ঢাকা-চট্টগ্রাম ৪ লেন বিশিষ্ট এক্সপ্রেস সড়ক নির্মাণের প্রকল্পটি শুরু হলেও প্রতিশ্রুত সময়সীমার তুলনায় অগ্রগতি অনেক পিছিয়ে আছে। রেলপথ সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়নের তেমন সফলতা নেই। বাংলাদেশ বিমান একটি দুর্নীতিগ্রস্থ ও অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে রয়েই গিয়েছে।

**গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও অবাধ তথ্য-প্রবাহঃ** সকল প্রকার গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও তথ্য-প্রবাহের অবাধ চলাচল সুনিশ্চিত ও সংরক্ষণ করা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও গণমাধ্যম শতভাগ স্বাধীনতা ভোগ করতে পারছে না। এই সরকারের আমলে চ্যানেল ওয়ান এর সম্প্রচার বন্ধ করা হয়েছে এবং যমুনা টিভি অনুমোদন পায়নি। টক শো বন্ধ করারও নজির রয়েছে। সংসদে পত্রিকার এবং টিভি সংবাদের সমালোচনা এবং তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি প্রদান করা হয়েছে। *আমার দেশে*'র প্রকাশ বন্ধ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও, আদালতের হস্তক্ষেপের ফলে তা কার্যকর হয়নি।
সকল সাংবাদিক হত্যার দ্রুত বিচার করে প্রকৃত অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা এবং সাংবাদিক নির্যাতন, তাদের প্রতি ভয়-ভীতি-হুমকি প্রদর্শন এবং সকল মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করার প্রতিশ্রুতি দেয়া হলেও তা বাস্তায়নের কোন সদিচ্ছা পরিলক্ষিত হয়নি। বরং সাগর-রুনী মর্মান্তিক হত্যাকান্ডের সুষ্ঠু না হওয়ার বিষয়টি সাংবাদিক সমাজকে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে। এছাড়া গণমাধ্যমের কর্মীদের ওপর পুলিশী হামলা ও এ ন্যাক্কারজনক কাজের প্রতি কতিপয় মন্ত্রীর সাফাই গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা নিয়ে সন্দেহের সৃষ্টি করেছে।

উল্লেখ্য যে, নির্বাচনের পর পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শেখ হাসিনা ৩১ ডিসেম্বর, ২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত এক জনাকীর্ণ সংবাদ সম্মেলনে ভাষণ দেন। সংবাদ সম্মেলনে তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেন যে, আমাদের সরকার হবে সকলের। আমরা ক্ষমতার অপব্যবহার করবো না। আমরা প্রতিহিংসা ও

প্রতিশোধের রাজনীতিতে বিশ্বাস করি না। আমরা হানাহানির রাজনীতি পরিহার করতে চাই। আমরা বিরোধী দলকে সংখ্যা দিয়ে বিচার করব না। আমরা বিরোধী দলকে ডেপুটি স্পিকারের পদ দেব। রাজি থাকলে বিরোধী দল থেকে মন্ত্রী করার ইচ্ছাও তিনি প্রকাশ করেন। তিনি দেশে এক নতুন রাজনৈতিক সংস্কৃতি উপহার দেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। এছাড়াও তিনি দারিদ্র্যকে 'সবচেয়ে বড় শত্রু' হিসেবে আখ্যায়িত করেন (*দৈনিক প্রথম আলো*, ১ জানুয়ারি, ২০১৯।

সকল রাজনৈতিক দলের প্রতি আহ্বান জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, 'আসুন, সব ভেদাভেদ ভুলে দেশের মানুষের জন্য একসঙ্গে কাজ করি। সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধী দলও রাষ্ট্র পরিচালনার অংশীদার। বিরোধী দলের ইতিবাচক সমালোচনা, পরামর্শ এবং সংসদকে কার্যকর করতে তাদের ভূমিকা ও মর্যাদাকে সমুন্নত রাখব।' তিনি দলীয় নেতা-কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'যেহেতু বিজয় অর্জন করেছি, তাই ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে হবে।' তিনি বলেন, বিজয়ের আনন্দে আত্মহারা না হয়ে সংযত থাকতে হবে। জনসেবার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। কিন্তু সরকারের মেয়াদের সাড়ে তিন বছর পার হওয়ার পর এসকল অঙ্গীকার বহুলাংশে অপূর্ণই রয়ে গিয়েছে।

এক্ষেত্রে সরকারের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা হলো নতুন রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ার ক্ষেত্রে। বর্তমান সরকারের আমলে রাজনৈতিক সংস্কৃতির ইতিবাচক পরিবর্তন তো হয়ই নি, বরং তার অবনতি ঘটেছে। প্রতিপক্ষের প্রতি অসহিষ্ণুতা ও প্রতিহিংসাপরায়নতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে পরবর্তী নির্বাচনকেই অনিশ্চিত করে ফেলেছে, যার ফলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিয়ে বহির্বিশ্বে সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে (প্রথম আলো, ১১ জুলাই ২০১২)। আরেকটি ব্যর্থতা হলো দুদককে শক্তিশালী করা এবং দুর্নীতি দমনের ক্ষেত্রে। সরকার দ্রব্যমূল্যও স্থিতিশীল রাখতে এবং দল ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীদের অপকর্ম থেকে বিরত রাখতে পারেনি। পারেনি জাতীয় সংসদকে কার্যকর করতে। আইনশৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনীকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার এবং প্রশাসনের দলীয়করণ অব্যাহত রয়েছে। সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সরকারের ব্যর্থতা চরম। সকল সরকারি কার্যক্রম যেন দলীয় স্বার্থে পরিচালিত হচ্ছে। দলতন্ত্র ও ফায়দাতন্ত্রের চর্চা, পশ্চাৎমুখীতা, শ্লোগান আওড়ানো, ব্যক্তিপূজা, গোষ্ঠীপূজা, মৃতের আরাধনা, প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার প্রচেষ্টা, সবকিছুতেই অতি দলীয়করণ ইত্যাদি যেন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছে। বিরাজমান অপশাসনের বর্ণনা দিতে গিয়ে সম্প্রতি বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান বলেছেন, দেশ এখন বাজিকরদের হাতে। ভর্তিবাজি, নিয়োগবাজি, টেন্ডারবাজি, দলবাজি, মতলববাজির রকমফের দেখে মানুষ দিশেহারা। পররাষ্ট্রনীতিতে এ সরকার খুব একটা সফলতা অর্জন করতে পারেনি। তিস্তার পানি বন্টন চুক্তি কার্যকর হয়নি। টিপাইমুখ বাঁধ নিয়ে সরকারের ভূমিকা অস্পষ্ট। এছাড়া নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে অতীত সরকারের ব্যর্থতার কথা জনগণকে বারবার স্মরণ করানো, অর্থাৎ 'ব্লেম-গেম'-এর প্রবণতা পূর্বের মতোই বর্তমান সরকারের মধ্যেও বিদ্যমান। তাই সত্যিকারার্থেই দিনবদলের সনদ বাস্তবায়ন করতে হলে সরকার যে সকল অনাকাঙ্ক্ষিত কর্মে নিজেকে লিপ্ত করেছে তা থেকে বেরিয়ে আসতে এবং ব্লেম-মেমের অবসান ঘটাতে হবে।

অনেকগুলো সমস্যা সমাধানের জন্য অবশ্য পুরো পাঁচ বছরের মেয়াদকাল, এমনকি তার বেশি সময়ও লাগতে পারে। তবে গত তিনবছরে সরকার কতগুলো প্রাথমিক কনফিডেন্স বিল্ডিং মেজার বা জনগণের আস্থা অর্জনকারী কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারতো। যেমন, ক্ষমতাধরদের সম্পদের হিসাব প্রদান, একটি আচরণবিধি প্রণয়ন, সরকারি দলের মদদে সন্ত্রাস-চাঁদাবাজি-দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ, দলতন্ত্র ও ফায়দাতন্ত্রের চর্চার অবসান, দুর্নীতি দমন কার্যক্রমকে জোরদারকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সরকার এ সকল ক্ষেত্রে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে, ফলে ব্যাপকভাবে জনসমর্থন, বিশেষত তরুণ ও সচেতন নাগরিকদের সমর্থন হারিয়েছে, যদিও এরাই মহাজোট সরকারকে মহাবিজয় উপহার দিয়েছিল।

সরকারের অবশ্য অনেকগুলো সফলতা রয়েছে, যার অনকেগুলোই ধারাবাহিকতার সফলতা। সবচেয়ে বড় সফলতা যুদ্ধাপরাধের বিচার প্রক্রিয়া শুরুর ক্ষেত্রে। বঙ্গবন্ধু হত্যার রায় বাস্তবায়ন এবং ২১শে আগষ্টের বর্বরোচিত ঘটনার পুনঃতদন্তও সরকারের সফলতার অংশ। এছাড়াও কৃষিক্ষেত্রে উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যাপক ভর্তূকি প্রদান করা হয়েছে। একটি শিক্ষানীতি প্রণীত হয়েছে, যদিও এটির বাস্তবায়ন এখনও বাকি। জঙ্গীবাদ দমনে সরকার কঠোর অবস্থান নিয়েছে। দারিদ্র্য দূরীকরণের ক্ষেত্রে বড় সফলতা হলো সামাজিক ও খাদ্য নিরাপত্তার বেষ্টনীর আওতায় ব্যাপকহারে খাদ্যশস্য ইত্যাদি বিতরণ, যদিও এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন কৌশল হতে পারে না এবং দুর্নীতির কারণে এগুলোর সুফল জনগণ পুরোপুরি পাচ্ছেনা। সরকার জ্বালানী ও বিদ্যুতের সমস্যার সমাধানে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালাচ্ছে এবং এক্ষেত্রে কিছু সফলতাও অর্জিত হয়েছে। তবে এ সমস্যা সমাধানের জন্য আরও সময়ের প্রয়োজন হবে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষেও সরকার অত্যন্ত সচেষ্ট।

বর্তমানে সবচেয়ে বড় সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে আগামী জাতীয় নির্বাচন। কারণ ইতোমধ্যেই সুপ্রীম কোর্টের রায়ের দোহাই দিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি বাতিল করা হয়েছে – যদিও অদ্যাবধি এসংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশিত হয়নি। যতটুকু নির্দেশনা দেয়া হয়েছে, তাতে আগামী দুইটি নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আওতায় করা যেতে পারে বলে মতামত দেওয়া হয়েছে এবং সে ক্ষেত্রে বিচারপতিদের এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত না করারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ক্ষমতাসীনরা উক্ত নির্দেশনার তোয়াক্কা না করে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি বাতিল করেছে। প্রধান বিরোধী দল ইতোমধ্যেই ঘোষণা দিয়েছে নির্দলীয় নিরপেক্ষ কোন সরকার ছাড়া আগামী নির্বাচনের তাঁরা অংশগ্রহণ করবে না। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার দাবিতে ১৮ দলীয় জোটগতভাবে তারা আন্দোলনও করছে। এদিকে গত ৩ জুলাই ২০১২ বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) ও বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)-এর ঐক্যবদ্ধ উদ্যোগ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে যৌথ সংবাদ সম্মেলন থেকে আরও দুই টার্ম তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতির আওতায় নির্বাচনের পক্ষে তাঁদের অবস্থান ঘোষণা করেছে। কিন্তু সরকারের কথাবার্তায় এব্যাপারে একগুঁয়েমি প্রকাশ পাচ্ছে। ফলে রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হচ্ছে। অনেকে এমন আশংকাও প্রকাশ করছে যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে জটিলতা সৃষ্টি হলে আবারো অগণতান্ত্রিক শক্তি শাসন ক্ষমতায় জেঁকে বসতে পারে। আর এবার যদি এমন কোন শক্তি ক্ষমতায় আসে, তাঁরা কোমর বেঁধেই আসবে – যা আমাদের দেশকে, আমাদের গণতান্ত্রিক অভিযাত্রাকে ব্যাহত করবে, যা কারোই কাম্য নয়।